পুষ্পিত অন্ধকার, বেরং শূন্যতা

আলোক সরকারের কাব্যগ্রন্থ 'অমূলসম্ভব রাত্রি'

[২০০৭ সালে শুরু হওয়া এই প্রবন্ধটি 'উপাংশু' পত্রিকার বিশেষ 'আলোক সরকার' সংখ্যার ফরমায়েশ লেখা। লেখাটি যখন শুরু করি, আলোক সরকার সস্ত্রীক ওঁর ছেলে অপ্রতিমের বোস্টনের বাড়িতে ছিলেন কয়েক মাস। যোগাযোগ, আলাপ ও আড্ডা হত মাঝে মাজে। সেই সমস্ত আলাপের একদিকে যেমন তীব্র অপত্যস্নেহ অনুভব করতাম, তেমনি তার অন্য অর্ধে পেতাম অজস্র অজানা তথ্য, বিশেষত জীবনানন্দকে ঘিরে। আলোকদার সঙ্গে 'অমূলসম্ভব রাত্রি' নিয়েও আলোচনা হয়েছে একাধিকবার। বইয়ের যে কপিটি আমি তখন পড়ছি, সেটাও আলোকদারই দেওয়া। ২০০৮ সালে প্রবন্ধটি বেরোয় 'উপাংশু' পত্রিকায়।]

খোলা মাঠের মাঝখান। বেলা পড়ে আসছে। একটা সি-স। তার একদিকে অসীম 'শূন্যতা' অন্যদিকে 'অন্ধকার'। ছবি এঁকে যদি আলোক সরকারের কবিতা কাউকে বোঝাতে হত, আমি এই ছবিটাই আঁকতাম। অবশ্য আমার কথাটা 'অর্থহীন', কেননা অন্ধকার ও শূন্যতাকে সি-স-এ বসিয়ে কোনো ছবি আঁকা সম্ভব নয়। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'অমূলসম্ভব রাত্রি' বইটা ৩০ বছর পর আলোচনা করতে গিয়ে বারবার এই তিনটে শব্দের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। 'অন্ধকার', 'শূন্যতা' ও 'অর্থহীনতা'। 'অন্ধকার' আসে অনুপস্থিতি নিয়ে। হীনতা নিয়ে। কেবল আলোর নয়, রঙেরও, কেননা আলোর অভাবে রঙের কোনো রূপ নেই। 'অন্ধকার' (ও তার বিবিধ প্রতিশব্দ, যেমন 'অমা', 'তমসা', 'কালো' 'রাত্রি') শব্দটা বারবার আসে তাঁর বহু কবিতায়। 'শূন্যতা' আসে এক নৈর্ব্যক্তিকতার রূপ নিয়ে, এক নির্দলীয়তা নিয়ে। আর 'অর্থহীনতা'-র দিকে কবির তর্জনী বারবার উঠে যায়। যাকে কেউ বলেন রূপক, কেউ প্রতীক, কেউ বাক্‌প্রতিম, তাকে নিরাভরণ, কখনো প্রায় বিবস্ত্র করে রেখে যায় আলোক সরকারের 'অর্থহীনতা'।

সম্প্রতি আলোক সরকারকে একটা চিঠি লিখতে বসে ওঁর প্রথম দিকের লেখালিখির যৎসামান্য মনে পড়ে যাচ্ছিল। আলোক সরকারের সৃষ্টিশীলতার আকৃতি ওঁর অতি সবুজ সময়কাল থেকেই নিরন্তর প্রকাশিত, প্রস্রবণিত। অল্প বয়সে আলোক সরকারের প্রথমদিককার কবিতা পড়তে পড়তে মনে হত মোগল গালিচার মতো বা ফ্রান্সের প্রভাঁস অঞ্চলের টেবিলচাদরের মতোই ওঁর কবিতার অতি সূক্ষ্ম রূপকতা। প্রাকৃতিকতার ঘন বুনোটে ঠাসা এক মিনিয়েচার কারুকাজ। অথচ গালিচার মতোই সেই ফুল্লতার নিচে একটা চুন-সুরকি-লোহা-সিমেন্টের মেঝে রয়েছে যা আমাদের দাঁড়াবার জায়গা। যেমন টেবিলচাদরের নিচে রয়েছে

তার কাঠামো-স্ক্রু। সাধারণ চোখে বা স্বল্প-চাহনিতে ধরা পড়ছে না। কিন্তু ত্রিনেত্র জানে তার অস্তিত্ব। ওই না-থাকার দিকেই আলোকের একটা ইঙ্গিত ছিল বরাবর যা অনেকে দেখতে পাননি। ক্রমশ প্রকাশ্য সেই অধরা। আলোক সরকারের ভাষায়— 'যা নেই তার কোনো মৃত্যু নেই'। অমর হয়তো সে-ই। অমোঘ হয়তো সে-ই।

এই চিঠি লেখার অব্যবহিতকালের মধ্যে আলোক সরকার ওঁর তিনটে প্রথম দিককার বই আমার পাঠান সুদূর বিদেশে— যথাক্রমে 'বিশুদ্ধ অরণ্য' (১৯৬৯), 'অমূলসম্ভব রাত্রি' (১৯৭৮), 'রৌদ্রময় অনুপস্থিত' (১৯৮৫)। প্রথমে খুলি 'অমূলসম্ভব রাত্রি'। প্রথম কবিতা থেকেই হাজারো বিস্ময়। দু-একটা কবিতার পরই আসে 'লাল সুতো বোনা ফুল' কবিতাটা। একাংশ এইরকম—

'স্মৃতির বিক্রমে বস্তু বাস্তবতাচ্যুত, আমি বড় ভয় পাই।
আমি বারবার ভাবি লাল সুতো-বোনা টেবিলঢাকার প'রে
লাল সুতো-বোনা ফুল মাঝে মাঝে কালো সুতো ছিলো। আমি বাস্তববাদী
ভাবি লাল ফুল ছিলো টেবিলঢাকার 'পরে, মাঝে মাঝে কালো সুতো ছিলো।

প্রথমপাঠে শুধু মুগ্ধ হই না, এক সমানুপাতে আরো একবার বিস্মিত হই। আলোকের কবিতা পড়তে পড়তে সেই ফ্রান্সের প্রভাঁস অঞ্চলের টেবিলচাদরের নকশার কথা মনে পড়ে। তার নিখুঁত পুষ্পিত শোভার তলে তলে যে একটা যুক্তি ও ভাবনার কঠিন কাঠামো আছে, তার কথা। উপরোক্ত কবিতাটা যেন আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিলো। আপাতভাবে যে কবিতাকে প্রেমের মনে হয়, তার অভ্যন্তরে জীবন ও শিল্পসন্ধানের এমন গূঢ় সংকেত লেখা আছে, স্মৃতির ভিতে রাখা আছে এমন জোরালো এক দর্শন, অথচ গোটাটাই চাদরের ফুলের নিচে ঢেকে রাখা— কবিতাটাকে আমি চিরতরে স্মৃতিবন্দি করি।

বিশ শতকের এক উল্লেখযোগ্য ফরাসি কবি ইভ বনফোয়া একবার বলেছিলেন— 'কবিতা বস্তুকে তার প্রকৃত বাস্তবতায় ফেরাতে সাহায্য করে।' প্রায় সেই একই কথা ধ্বনিত হয় আলোক সরকারের কবিতায়— 'স্মৃতির বিক্রমে বস্তু বাস্তবতাচ্যুত।' স্মৃতির জন্ম অভিজ্ঞতা থেকে। সেই স্মৃতির বিক্রমেই বস্তু তার প্রকৃত বাস্তবতাচ্যুত। সেই হৃত বাস্তবতাকে ফেরায় প্রান্তিক বস্তুগুলো। এক্ষেত্রে টেবিলঢাকার লাল সুতোয়-বোনা ফুল। তারাই কালো সুতোর নকশায় মিশে প্রকৃত বাস্তবতার সংরক্ষক হয়ে ওঠে।

বীজ ফেটে বেরোনো নতুন কাপাসে তুলোটে মেঘের দিকে নির্দেশ হেনেও আলোক সরকার সন্তর্পণে সেই তুলো থেকে সামান্য সরু সুতি বের করবেন। এক অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও তার ফলাফল দেখিয়ে দেবেন আমাদের। যেমন 'জন্মদিন' কবিতাটা দখল করে ফেলে এক কোনোদিনের না-দেখা পাখি। আর কিছুই নয়, সেই পাখি—

'আর কিছুই নয় কেবল সেই আগন্তুক পাখি অনভিযোজিত ছন্দহীন
আর কিছুই নয় কেবল সেই নিরুত্তাপ প্রখর, অকম্পন উচ্চারণ
বধির অর্থহীনতায় ভাসালো তিমির সংকেত, তার জন্মদিনের সকালে'

এখানে মার্কিন কবি অ্যাশবেরির কাব্যগ্রন্থ 'Can You Hear Bird' (শুনতে পাও পাখি)-কে মনে না করে উপায় নেই। যদিও অ্যাশবেরির কাব্যপ্রয়াস আলোক সরকারের চেয়ে ভিন্ন, তবু শব্দ, ভাব, রূপক ও চিন্তনের বহু ক্ষেত্রে তাঁদের কবিতা একে অন্যের গায়ে এসে পড়ে। পড়ে এমন এক সাযুজ্যে যা বিস্ময়সূচক। অথচ অ্যাশবেরি যেমন আলোক সরকারের কবিতা পড়েননি, তেমনি আলোক সরকার পড়েননি অ্যাশবেরিকে। 'শুনতে পাও পাখি'-র নামকবিতাটি ওই 'বধির অর্থহীনতা'-র দিকেই যেন আমাদের পরিচালিত করে। 'জন্মদিন' গৌণ হয়ে যায় কবিতা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে। আমার মনে হতে থাকে জন্মদিন নিয়ে কবিতাটির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তার কেন্দ্রগ ওই পাখিটা। তার আবিষ্কারই 'জন্মদিনের সকাল'-এর গুহ্য গুরুত্ব। প্রায় একইরকমভাবে 'শূন্যতা' কবিতাটি একটা গাছের অনুপস্থিতির। দেহকে অনুভব করা বিদেহীর মাধ্যমে। শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি আমাদের অবহিত করেন অশরীরীর অস্তিত্ব জানিয়ে। ভাবকে বয়ে আনে অভাবের পয়ঃপ্রণালী। জন অ্যাশবেরি একবার লিখেছিলেন— 'যদিও তুমি দেখতে পেলে বহু বছর আগের ওই হিমশৈলগুলো/ মূল চাঙড় থেকে খ'সে পড়ছে/ জলের নিচে ডুব দিচ্ছে ভেসে থাকতে'। পড়তে পড়তে খেয়াল হল ভেসে থাকার জন্য ডুবে যাওয়াও জরুরি, অন্তত বরফবিজ্ঞান তো তা-ই বলে। এ-ও সত্যি যে হিমবাহ-র যতটা জলের ওপর ভাসছে তার চেয়ে অনেক গুণ ডুবে আছে। এই 'হিমবাহ'-র ভেসে থাকার প্রক্রিয়াও হয়তো আলোকের কবিতাকে ধরার চাবিকাঠি।

মাঝে মাঝে মনে হয় একজন কবির কবিতা যে পৃথিবীর কত স্থানে ভিন্নকারে তার অবতারকে ফেলে রেখেছে কবি নিজেও হয়তো জানেন না। দূরবর্তী কত

কবিতার সঙ্গে নিজেদের কবিতার রক্তের গ্রুপ মিলে যেতে দেখে আমরা চমকে উঠি। হয়তো কবি ও কবিতা এইসব টেলিপ্যাথিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে জানে। ইরান ও তুর্কি কবিতায় কেউ কেউ এই 'অবলা' বা 'অকথন'-এর ওপরে জোর দিয়েছেন। এদের মধ্যে ওরহান ভেলির কথা বিশেষ উল্লেখ্য। অনেক তরুণতর, প্রায় আমাদের সমসাময়িক সামি বায়দার, তার কবিতার মধ্যেও নৈঃশব্দ্য বা শূন্যতার একটা আলাদা বাসস্থান রয়েছে, যদিও প্রত্যেকের মধ্যেই তার প্রকাশ ভিন্ন। ইদানীং এক মার্কিন মহিলা কবি, প্রায় আলোকের সমসাময়িক— ক্যাথলিন ফ্রেসার— ওঁর কবিতার সংস্পর্শে এলাম। জীবনের একটা সময়ে যখন ইতালিতে বিদেশিদের মধ্যে ভাষাজ্ঞানের অভাবে উনি প্রায়শই অস্বচ্ছন্দ, মৌন, সেই সময়ের কিছু কথা (ওঁর এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া) মনে পড়ে। ঠিক শূন্যতা হয়তো নয়, তবে শব্দাভাব, বা নৈঃশব্দ্যকে বহন করার একটা চেষ্টা ওঁর ওই সময়ের কবিতায় আছে।

অনেক সময়ে মনে হয় আলোক সরকারের কবিতার চালচিত্র গড়া ঘন, মেঘলা, অন্ধকার মেঘরঙে। অগ্রজ অরুণকুমার সরকার একবার আলোকের 'অন্ধকার উৎসব' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর কবিতায় 'কিশোরকাল অর্থে শিকড়, মাটির নিচের দৃঢ় অন্ধকার আশ্রয়।'[১] 'অমূল্যসম্ভব রাত্রি'-র এই অন্ধকার রেমব্রান্টীয়। আবার হয়তো রাবীন্দ্রিকও (চিত্রকর রবি)। সে কেন্দ্রীয় নয়, বস্তুর আভরণ। মুখের চারপাশে বিরাজ করে সেই অন্ধকার আসলে মুখের ডৌলটা কিছুটা অস্পষ্ট করে দিতে চায়। আমরা টের পাই অন্ধকার কারো উপমা, যেন কীসের রূপক। কিন্তু ঠিক কীসের সেটা নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একাধিক কবিতা পড়ার পর বুঝতে পারি তার ওই অনচ্ছতা ইচ্ছাকৃত। রূপককে আলোক যেন কিছুটা গোপনে ব্যবহার করতে চান। পাঠককে বুঝতে দিতে চান না তাঁর ব্যবহার। এমনকী আলোচককেও নন। আকারে তাকে রূপক বলে কখনো মনে হলেও, অভিপ্রেতে মনে হয় না। তাকে প্রায় লেই করে কবিতায় মিশিয়ে দেন অথবা মুখের পাশে রাখেন রেমব্রান্টীয় অনালোকে। চিত্রকলার কিছু পদ্ধতির কথা এখানে বারবার মনে পড়ে। যেমন ফিগার-ড্রইং এর পর অনেক চিত্রশিল্পীই স্থূল চারকোল রেখা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে পাতলা করে দেন, বা প্যাস্টেল চিত্র হলে অনেকে একটা কাগজ ভাঁজ করে প্যাস্টেলরেখার ওপর ঘষে ঘষে তাকে ফিকে করেন, আলোক সরকারের রূপক ব্যবহার-পদ্ধতিও যেন অনেকটা সেইরকম।

কবিতার ভাষায় লক্ষ করি একটি বৃত্তীয় চরিত্র। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সামান্য

বদলে ঘুরে ঘুরে আসছে। ঠিক বৃত্তের মতো নয়, স্পাইরালের মতো, বৃত্তাকারে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যবহারেই সামান্য বদলানো, যেন ভাবনাটাকে একটু একটু করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার গন্তব্যের দিকে। বইটা পড়তে পড়তে শুনতে পেয়েছি এক দূর আখমাড়াই কলের শব্দ। এই বৃত্তাকার শব্দসারি নিজেদের পথ অল্প বদলে স্পাইরালিং অ্যাকশনে কবিতাকে দোহন করে। একটু একটু করে বের করছে তার ঐশী নির্যাস। তারপর কখন চাকার পাশে পড়ে যাচ্ছে আখের ছিবড়ে, টের পাওয়া যায় না। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে মনে হয় ওই ছিটকে পড়া ছিবড়েটাই কবিতার বিষয় যা কৃশ, আপাত অমসৃণ, যার কাজ একটাই— ওই বৃত্তাকার ভাষাক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, নির্যাসটুকু গ্রাহকের মনে ঝরিয়ে দিয়ে, ছিবড়ে হয়ে কখন তার অজান্তে বর্জিত হওয়া। যেমন 'অবসান' কবিতাটির কয়েক পঙ্‌ক্তি—

'সবাই চলে যাওয়ার পর দেখতে পেলুম বেলফুল।
.....
একটি মাত্র বেলফুল ছোট্ট একটা চারাগাছ।
.....
সবাই চলে যাওয়ার পর ছোট্ট একটা চারাগাছ দেখতে পেলুম অকম্পন।
.....
মলিন অন্ধকারের ভেতর সাদা একটা বেলফুল -.....
ওরা সবাই চলে গেছে ওরা সবাই ঘরে ফিরে গেছে
উঠোনের প্রান্তসীমায় একটি মাত্র বেলফুল - ওরা সবাই ঘরে ফিরে গেছে।'

ক্রমাগত কবিতার, মননের মাটি খুঁড়ে তাঁর বয়ান এগোয়। এক কেঁচোর মতো। তার নিরন্তর পরিশ্রম, যার প্রমাণস্বরূপ গায়ে লেগে থাকা কাদামাটি। আলোক সরকার লেখেন—

'মানে খুঁজতে গেলেই ফেনিয়ে উঠবে কৌতুক - শ্রমটাই তো আসল কথা
কাজ থাকে হাজাররকম সবগুলোই তো শ্রম নয়।'

(অরুণবরুণ কিরণে)

শ্রমটা চমৎকার বোঝা যায়। কবিতার প্রত্যেকটা পঙ্‌ক্তিতে লেগে থাকে তা। এবং এক্ষেত্রে আরো গূঢ়তর এক কাজ করে কবিতা। সুযোগ পেলেই

বিশেষ অর্থকে নাশ করে। নতুন অর্থসম্ভাবনাকে কবিতায় জাগিয়ে তোলার প্রথম ধাপ প্রথাগত অর্থ বা বিশেষ অর্থ নাশ করা। (এখানে আবার জন অ্যাশবেরির কথা আসবে। বাংলা কবিতায় আলোক সরকারের সমসাময়িকদের মধ্যে আসবে উৎপলকুমার বসুর কথা। গড়ার আগে ভেঙে দেখানোর কাজে ব্রতী এঁরাও।) বাক্যমালার এই পুনরুচ্চারণ প্রক্রিয়া আফ্রিকার ক্রিওল (creole) ভাষা-সাহিত্যেও রয়েছে, যার ব্যবহার পাওয়া যায় মার্তিনিকের কবি এমে সেজেয়ারের কবিতায়।

'অমূলসম্ভব রাত্রি'-র কবিতায় লক্ষ করি বহু শব্দ অ-অব্যয় দিয়ে শুরু। যেমন— অবিসংবাদিত, অপরিজ্ঞাত, অপরিকল্পিত, অলৌকিক, অনন্যতা, অবকাশ, অজানা, অখণ্ড, অবসান, অমূলসম্ভব, অপরিণত, অপরিবর্তন, অবিশ্রান্ত, অপস্রিয়তা, অনিশ্চিত, অপেক্ষমান, অলক্ষ্য, অনিবার্য, অনন্ত, অনভিযোজিত, অকূলবিস্তীর্ণ, অচিন্তন, অপ্রাপ্তি, অবিচ্ছেদ, অস্মিতা প্রভৃতি। এখানে সুধীন দত্তর কথা মনে পড়েই। অরুণকুমার সরকার সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'আর উচ্ছ্বাসের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অনীহা এতই প্রকট যে সর্বদা স্বরবর্ণের, বিশেষত অ-কার আ-কারের অনুপ্রাসই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।'[১] অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'অ' স্বরপ্রীতির প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'সুধীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ নঞ-সিদ্ধ কবি। বাংলা 'অ' স্বরটির মধ্যে তিনি অস্তি ও অনস্তির সহ-অবস্থান লক্ষ করেছেন। অন্য কোনো বাঙালি কবি সুধীন্দ্রনাথের মতো এমন বিপুলভাবে এবং এমন অবিরাম 'অ' যুক্ত পদ ব্যবহার করেননি।'[২] আলোক সরকারের এই শব্দপ্রবণতা যেমন যেমন নিরাবেগের প্রতি তাঁর ঝোঁকের অভিজ্ঞান, তেমনি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করলে বোঝা যায় বস্তুর অস্তিত্বকে সন্তর্পণে সরিয়ে এক নির্দলীয়কে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বধ্যপরিকর। যেখান থেকে দেখার শুরু, সেই জমিতে আলোক সরকার প্রথমে দেখতে চান শূন্য করে। উদাহরণস্বরূপ—

'আর কিছুই নয় কেবল সেই আগন্তুক পাখি অনভিযোজিত ছন্দহীন'

এখানে অভিযোজনার ভাবনাটা তিনি পাঠকের মন থেকে মুছে দিতে চান। আবার সেই সঙ্গে অভিযোজনা সম্পর্কে তাকে সচেতনও করেন। ফলে কাঙ্ক্ষিত শূন্যতার মাধ্যমে আলোক হয়তো দেখাতে চান যা তাঁর নিজের ভাষায়— 'যা আছে তার ভিতর দিয়েই না যাবার দিকে যাওয়া।'

এখান থেকে অস্তিত্ববাদের কথা উঠতে পারে। অন্তত আমার মনে অস্তিত্ববাদের কথা এসেছে। কিয়ের্কেগাদ ও নীৎসের ভাবনায় ছিল— 'ঈশ্বরের অনস্তিত্বেই মানুষের মুক্তি।' আলোক সরকারের দর্শন হয়তো এই অনাস্তিক্যের

বিপরীতেই, কিন্তু শূন্যতা বা অনস্তিত্বের মাধ্যমে অস্তিত্বের অনুভব তাঁর কবিতায় পারস্পরিক। আগের পঙ্‌ক্তিতে হয়তো সবটা বলা হল না। বা হয়তো ভুল বলাও হল। 'শূন্যতা'-কে ভারতীয় দর্শন যে পূর্ণতায় দেখে, পাশ্চাত্যের দর্শন সেভাবে দেখে না। পাশ্চাত্যে 'শূন্যতা'-র কোনো নিজস্ব দর্শন নেই। 'শূন্যতা' কেবলমাত্র একটা অভাব, অস্তিত্বের অভাব। ফলে অস্তিত্ববাদী শিল্প ও সাহিত্য এক এক সময়ে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হতে থাকে। সেখানে না ধরা পড়ে আনন্দ, না আস্তিক্য। ভারতীয় 'শূন্যতা'-র সচ্চরিত্র ইতিবাচকতার প্রতি বেশ কিছু পশ্চিমী কবি ইতিমধ্যেই আকর্ষণ বোধ করেছেন। টি এস এলিয়ট তো বটেই, আধুনিকোত্তর কালে অ্যালেন গিন্সবার্গ ও অক্তাভিও পাজ।[৩] এখানে এসে পড়বে মালার্মের কথাও। আলোক সরকারের কবিতালোচনায় বহু কবি ও আলোচক মালার্মের প্রসঙ্গ টেনেছেন। প্রায় ৪০ বছর পূর্বে দীপ্তি ত্রিপাঠী আলোক সরকারের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সেই সুষমা, স্বপ্নময়তা, চিত্ররূপ, সঙ্গীতের রেশ— যা শেষ হয়েও শেষ হয় না— অনেকক্ষণ মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকে, এমন এক সঙ্গীতময় জগতে তিনি নিয়ে যেতে পারেন যা হয়তো মালার্মের কাম্য ছিল।'[৪] সম্প্রতি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আলোক সরকারের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'মালার্মের কবিতা ওঁর পছন্দ ছিল। অনুপস্থিতির ধারণা মালোর্মে থেকেই পেয়েছিলেন।'[৫] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ: এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।'[৬] সুধীন্দ্রনাথ যেভাবে মালার্মেকে পড়লেন সেভাবে আলোক সরকার পড়েছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। যেমন অনুপস্থিতির মাধ্যমে তিনি উপস্থিতির কথা বলছেন তেমনি ইতিবাচকের ভেতরে পুনচক্রিত করেছেন ইতিকে। 'অমূলসম্ভব রাত্রি'-র একাধিক কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি লক্ষ করা যাক—

ক) 'এইসব জানা আমার অনেকদিনের অজানা'

(মালা)

খ) 'কথোপকথন ছিলো হাত মুখ সঞ্চালন'

(দ্যুতি)

গ) 'বাড়ির ভিতর থাকতে থাকতে আরো বেশি ইচ্ছে করে বাড়ির ভিতর থাকবার'

(নিমফলগুলো)

ঘ) 'একটি বর্ণের ভিতর ছিল আমার অমানিশা'

(অরুণবরুণ কিরণে)

যে অস্তিত্ববান তাকেই পুনর্নিয়োজন করে, পুনর্বিন্যাসিত করে আলোক সরকার তাঁর মুক্তিকামিতা, তাঁর আস্তিক্যকে প্রকাশ করতে চান।

শেষে একটা কবিতার কথা আলাদা করে বলতে ইচ্ছে হল। কবিতার শিরোনাম 'প্রত্যাবর্তন'। কবিতা শুরু হয় এমনভাবে—

'তালিকা অন্যরকম। ছড়ানো রয়েছে প্রস্তাবনা। নির্বাচন প্রত্যাশী প্রস্তাবনা।
বাড়ির বাঁদিকে কোনো গাছ নেই, খাঁচার পাখির যথারীতি।'

এর অল্প পরে—

'বস্তু বিশ্লেষণ চায় বিশ্লেষণের রীতি ব্যক্তির আঁধারময় পটভূমি
স্মৃতি ও কল্পনা তার অবিচ্ছেদ্য। তুলেছো উৎসুক দুই চোখ!
নির্বাচন চায় এক পদ্ধতিকে - স্মৃতিহীন স্বপ্নহীন বস্তুরাজি, তালিকা তো
বিদেশী ধ্বনির অনাত্মীয়।'

অনবরত ছুটে আসা প্রশ্নের ঝাঁকে মন ছেয়ে যায় কোনো বোধ জন্মের বহু আগে। কীসের তালিকা? কীসের প্রস্তাবনা? কীসের নির্বাচন? এরপরেই বাড়ির বাঁদিকে গাছের কথা, খাঁচার পাখির কথা কেমন আচমকা! 'খাঁচার পাখির যথারীতি' বলা হল কেন? বিশ্লেষণের রীতি কেন 'ব্যক্তির আঁধারময় পদ্ধতি'? বস্তুর বিশ্লেষণের সঙ্গে স্মৃতি ও কল্পনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেন? কীভাবে? ক্রমশ টের পেতে শুরু করি এই প্রশ্নগুলোই পাঠকের কাছে জরুরি প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো মনে এলেই পাঠক ঠিক উত্তর খুঁজে পাবেন তাঁর মতো করে। আমি কীভাবে পড়লাম, সে কথা লিখি। উপরোক্ত কবিতা আমাকে কবিতার গঠনপদ্ধতির কথা মনে করিয়েছে বারবার। সৃষ্টির মৌলিক বিজ্ঞানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কেবল শিল্প নয়, যে কোনো সৃষ্টির অভিমুখে অনেক পথ থাকে, অনেক প্রস্তাবনা। স্রষ্টা বা সৃষ্টি বেছে নেয় এর একটাকে। নির্বাচনের কথা আসে এইভাবে। অজস্র ছড়ানো প্রস্তাবনা আসলে আমাদের প্ররোচিত করে। নির্বাচন চায়।

আসে এক পদ্ধতিভাবনার কথাও। হয়তো নির্মাণপদ্ধতি। প্রথমে নির্বাচিত এক বস্তুজাত ভাব বা ভাবনা। সেই ভাবনাই নির্বাচিত এক পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে তুলছে সৃষ্টিকে। বস্তু সৃষ্টির মাধ্যম নয়, সে কেবল আমাদের মনস্তত্ত্বকে

কামনা করে। আমাদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসে তার প্রকোষ্ঠে। চায় বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের রীতি স্রষ্টার নিজস্ব। তার মননের 'অনভিযোজিত অন্ধকার'-এ লুকোনো। সেখান থেকেই স্মৃতি (যা অভিজ্ঞতাজাত) ও কল্পনা (যা প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বর্ধনজাত) জন্ম। বস্তুর পালিশকে তারাই ঘষে তুলে তাকে ধূসর করে, অস্পষ্ট করে, তার ত্রিমাত্রা তারাই টেনে লম্বা করে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে শিল্পনির্মাণ ভাবনা ও তার দর্শনকে কেন্দ্র করেই এই কবিতার বিষয়। যে সময় এই কবিতা লেখা, সেই সময়ের তুলনায় যুগাধিককাল এগিয়ে থাকা এক কাব্যপ্রয়াস।

আলোচ্য গ্রন্থ:

অমূলসম্ভব রাত্রি: আলোক সরকার
শতভিষা, অগাস্ট ১৯৭৮
প্রচ্ছদপট: প্রণবেশ মাইতি
দাম: ৪ টাকা

গ্রন্থসূত্র:

১। 'তিরিশের কবিতা ও পরবর্তী'। অরুণকুমার সরকার। প্যাপিরাস, ১৯৮১
২। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা।' সম্পা: জগন্নাথ চক্রবর্তী। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮
৩। 'অন্বিষ্ট শূন্যতা': প্রবন্ধ। আর্যনীল মুখোপাধ্যায়। কবিতা পাক্ষিক ২৭০-২৭১, পৃ: ১৯-৩৫, ক পা, কলকাতা বইমেলা, ২০০৪
৪। 'একালের প্রেমের কবিতা': সূচনা। সম্পা: দীপ্তি ত্রিপাঠী। বিশাখা, ১৯৬৯
৫। 'সাক্ষাৎকার: প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত'। সুজিত সরকার। কৃত্তিবাস, নবপর্যায় ২৯ নং, পৃ: ৯৮। কৃত্তিবাস, ২০০৬
৬। 'সংবর্ত: ভূমিকা'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত